Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 65 – 78
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অরুণ মিত্রের কবিতায় পুনরুক্তির প্রসাধন

সৌরভ চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : write2sourav23@gmail.com

Keyword
অরুণ মিত্র, কবিতা, শৈলী, মনস্তত্ত্ব, পুনরুক্তি, সংসক্তি।

Abstract
কবিতার প্রতিটি শব্দ অপরিহার্য। তাই কবিতার শব্দের কোনো প্রতিশব্দ হতে পারে না। 'Paradigmatic Choice' -এর মধ্যে দিয়ে অনিবার্য শব্দগুলি পরপর বসে পড়লে তবেই তারা একসাথে একটি কবিতা হয়ে উঠতে পারে। এই কারনেই জ্ঞাপনের ভারে কবিতার যেমন স্বধর্মচ্যুতি ঘটে, তেমনি প্রকাশের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অবারিত দ্বার তো তার-ই।

এমন সংবেদনশীল সাহিত্যের প্রকরনে যেখানে বাড়তি কথা তো বাদ-ই দিলাম, কথা বলবার-ই ভার দেওয়া দায়, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তি তো অতিকথন বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি কবিতার শরীরের প্রতিটি শব্দ থেকে ছেদ-যতি চিহ্ন পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গে লুকিয়ে থাকে ব্যঞ্জনা। আর তাই নিছক পুনরুক্তির প্রয়োগ দীক্ষিত কবির হাত দিয়ে হওয়া অসম্ভব।

যেহেতু কবিতা উচ্চারন ছাড়া অসম্পূর্ণ, তাই শ্বাসাঘাতের ভিন্নতায় কবিতার একই বাক্য বা বাক্যাংশ সম্পূর্ণ আলাদা ভাবের প্রকাশ করতে পারে। আমাদের আলোচনায় এই পুনরুক্তি শুধু বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি আমরা অরুণ মিত্রের কবিতায় শব্দগত পুনরুক্তির তাৎপর্য বোঝবার ও চেষ্টা করেছি। এমনকি সমজাতীয় শব্দের ব্যবহারে প্রায় একই ভাবের পুনরুক্তিও আমাদের আলোচনার মধ্যে এসেছে। আর বাক্য বা বাক্যাংশগত কিংবা শব্দগত পুনরুক্তি উদ্ধৃত করে আমরা দেখেছি অরুণ মিত্র নিছক ভাবের উচ্ছ্বাসে একই বাক্য বা শব্দকে দুটি আলাদা সরণীতে দাঁড় করিয়ে ভিড় বাড়াননি। বরং স্বরক্ষেপনের ভিন্নতায় কিংবা শব্দার্থতাত্ত্বিক সম্পর্কের অনিবার্যতায় আভিধানিক অর্থের সীমাকে অতিক্রম করে বলিষ্ঠ ডানায় ভর দিয়ে উড়ান দিয়েছে প্রকাশের আকাশে। সেখানে সে কখনও হয়েছে বিবৃতি, কখনও বা স্বগতোক্তি, কখনও বা উপলব্ধি আবার কখনও বা বহন করে এনেছে অন্য কোনো তাৎপর্য।

আমরা এই প্রবন্ধে সচেতনভাবে বাদ রেখেছি 'ধ্বনিগত' বা 'Syllable Centric' পুনরুক্তির প্রসঙ্গ। আসলে আমাদের এই আলোচনা ধ্বনিতাত্ত্বিক নয়। তাই শব্দার্থতাত্ত্বিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং তাকেও কখনও কখনও

অতিক্রম করে আমরা অরুণ মিত্রের নির্বাচিত কয়েকটি কবিতায় পুনরুক্তির বৈচিত্র্য এবং ভাবের প্রকাশে তার অসীম শক্তিকে ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি।

Discussion

আমরা এই আলোচনা শুরু করতে পারি অরুণ মিত্রের-ই কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে —

"কবিতায় কথা বলি, তা নাকি তক্ষুনি হয়ে যায়
অলংকার। তবে এই অলংকারই পরো।
এ-সজ্জা বানাতে আমার তো দিন যায় রাত যায়
বিন্দু বিন্দু রক্ত যায়; একবার পরে দেখতে পারো
কোথায় তা ঠিকরোয় আলো, প্রসাধনে,
না তোমার হৃৎপিণ্ডে?"[১]
(অলংকার)

এখানে কবি স্পষ্টতই কবিতায় কথা বলার কথা যেমন বলছেন তেমনি সেই নির্দিষ্ট শৈলীতে কথা বলার জন্য বা সেই সজ্জায় কথাকে সজ্জিত করতে গিয়ে তাঁর যে উদয়াস্ত রক্ত ঝরা পরিশ্রম (এই পরিশ্রম অবশ্যই মানসিক বা ভাবনার) আছে তাও স্বীকার করছেন। এখানে অবশ্যই একটি বিতর্কের অবতারণা হতে পারে। সেই কবে, ১৮০১-এ 'The preface to the Lyrical Ballads' প্রবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন — 'Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings... recollected into tranquility;' — যা পরবর্তীতে কবিতার প্রবাদপ্রতিম সংজ্ঞায় পরিণত হয়। তাই অনেকেই কবিতার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততাকে যোগ করে কবিকৃতি বা কবিতার শৈলীকেও স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস-ই করেন না কবিকৃতির মাঝে প্রচেষ্টা শব্দটির থাকার অধিকার আছে। কিন্তু আমরা যদি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রগাঢ় ভাবনাজাত বাক্যটির বাংলা অনুবাদ করি তাহলে বুঝতে পারব তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন— 'কবিতা হচ্ছে শক্তিশালী বা প্রগাঢ় অনুভূতিসমূহের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ— প্রশান্তির মাঝে যা মনে আসে'।

এখানে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি শক্তিশালী অনুভূতিসমূহের প্রকাশ রীতিকে স্বতঃস্ফূর্ত বলা হয়নি; বরং বলা হচ্ছে কবিতার মধ্যে সেই প্রগাঢ় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ থাকবে। যেখানে বানিয়ে বলা কথা, বা ধার করা অনুভূতি দিয়ে কাজ চালানো যাবে না। গেলেই বিপত্তি। তখন অনুভূতির প্রগাঢ়তা যেমন থাকবে না, তেমনি অগভীর অনুভূতি দিয়ে পাঠক বা শ্রোতার মনে সেই ভাবের সঞ্চার করাও যাবে না। তা বলে এখানে কবিতার প্রকাশ বা শৈলীকে কখন-ই spontaneous বলা হয়নি। বস্তুত রচনা কৌশল যদি স্বতঃস্ফূর্ত হত তাহলে তো সাহিত্যের পাঠান্তর থাকত না। আসলে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটোগল্পকার বা অন্য যে কোনো ধারার স্রষ্টা যা সৃষ্টি করতে চান সেটা কোনোদিন-ই তিনি পুরোপুরি করে উঠতে পারেন না। এই অতৃপ্তি নিয়েই তো একটি পাঠকৃতি বারবার রচিত হয়। আর সেই পাঠান্তরে যাওয়ার অভিমুখটি তো নির্দেশ করে আসলে স্রষ্টা ঠিক কী সৃষ্টি করতে চাইছেন। তাই বলাই যায় কাঙ্ক্ষিত সজ্জায় সৃষ্টিকে সজ্জিত করতে স্রষ্টার বিন্দু বিন্দু রক্ত যায়।

এখন প্রশ্ন এই সজ্জা কী? সজ্জা আসলে শৈলী। এই শৈলী আবার সাহিত্যের প্রকরণভেদে এক এক রকম। আমরা যখন কথা বলি তখন যেভাবে বলি, লেখার সময় সেভাবে লিখি না। আবার উপন্যাস যেভাবে লেখা হয় কবিতা সেভাবে লেখা হয় না। একের সঙ্গে অন্যের বিবিধ পার্থক্য একাধিক parameter-এর সাপেক্ষে দেখানো যেতে পারে। আর এই parameter গুলির মধ্যে অন্যতম পুনরুক্তি।

পুনরুক্তি শব্দটি সন্ধিবিচ্ছেদ করলে আমরা পাই - পুনঃ + উক্তি। অর্থাৎ যে উক্তি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়। এই পুনরুক্তিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

১. বাক্যগত পুনরুক্তি
২. বাক্যাংশগত পুনরুক্তি

৩. শব্দগত পুনরুক্তি

৪. সমজাতীয় শব্দের ব্যবহারে প্রায় একই মনোভাবের পুনরুক্তি

এছাড়াও আমরা ধ্বনিগত কিংবা Syllable Centric পুনরুক্তির বিন্যাসও পাই। কিন্তু এখানের আলোচনা যেহেতু ধ্বনিতাত্ত্বিক নয়, তাই সঙ্গত কারনেই এই দুই পুনরুক্তির প্রসঙ্গকে আমাদের এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

বস্তুত আমাদের মনের একটি নির্দিষ্ট ভাবকে জ্ঞাপন করতে তো একই বাক্যের বারবার ব্যবহার সাধারণত আমরা করি না। আর যদিও কখনও করি তাহলে কথকের জ্ঞাপনের ভাবের উপর আরোপিত হয় তাঁর নির্দিষ্ট মনোভাব। সুতরাং আমরা বলতে পারি একই শব্দ বা বাক্যাংশ অথবা বাক্য একটি পাঠকৃতিতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে কবির আলাদা আলাদা মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটায়। তাই বলা যেতে পারে প্রতিটি পুনরুক্তিই কবিতায় স্বতন্ত্র তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে আমরা শিশিরকুমার দাশের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি—

> "বারবার একশব্দের বা একধরনের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে লেখকের একটি অভিপ্রায় নিহিত থাকা স্বাভাবিক। এরকম ব্যবহার যদি এক-আধবার হত, তাহলে এদের খুব গুরুত্ব না দিলেও চলত, এদের আকস্মিক হিসেবে গণ্য করা যেত। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনো লেখকের এইরকম ব্যবহারের প্রবণতা আছে, এবং তার লেখায় এই ধরনের প্রয়োগ প্রচুর তখন তাকে আকস্মিক বলা ঠিক হবে না।"[২]

যে কোনো পাঠকৃতির ক্ষেত্রে পুনরুক্তি ব্যবহারের অনেক কারণ থাকে। যেমন, বিরক্তি বা বিস্ময়ের বোধ প্রকাশ করতে এই কৌশল ব্যবহার করা হয়, তেমনি কোনও অবিশ্বাস্য ভাবকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেও এই শৈলীর প্রয়োগ করা হয়। বস্তুত কবির মনস্তাত্ত্বিক চাপেই নির্মিত হয় পুনরুক্তি। এ প্রসঙ্গে আমরা Croft এর মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি—

> "The technique of repeating or listing several words with the same or similar meaning (sometimes called cumulation) is often used to add emphasis or a persuasive quality to the poem such repetition of a word or words can add force and power to the subject or it can be used to work towards a dramatic climax."[৩]

আসলে আভিধানিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি কাব্য প্রসঙ্গের উপরই focus করে। এখানে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব—

"লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা
আর আমাদের কথা।
জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তা
আর আমাদের কথা
দোয়েল শ্যামার আনাগোনার সঙ্গে
আমাদের কথা
বৃষ্টির মেঘ গলে পড়ার সঙ্গে
আমাদের কথা
আমাদের সেই সব কথা
ঝরে গিয়ে ক্রমে সরে গিয়ে
মাঝখানে মরা জমি ছাই
হাওয়ার ধুধু ফাঁকা পথ।"[৪]

(স্পর্শ থেকে সরে গেলে)

আমরা কবিতাটির এই উদ্ধৃতাংশটি পড়ে দেখতে পাচ্ছি 'আমাদের কথা' শব্দগুচ্ছটি কবিতায় একাধিকবার এবং 'সরে গিয়ে' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়ে কাব্যপ্রসঙ্গকেই emphasis করছে। এ প্রসঙ্গে কবিতার নামকরণকেও আমরা এই

আলোচনার অন্তর্ভুক্তি করব। অরুণ মিত্র এই কবিতাটির নামকরণ করেছেন— 'স্পর্শ থেকে সরে গেলে'। কবিতা পাঠে আমরা বুঝতে পারছি কবিতাটি স্পষ্টত ভাবের দিক থেকে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে স্পর্শে থাকার অনুভূতি আর দ্বিতীয় অংশে আছে স্পর্শ থেকে সরে যাওয়ার পরের অনুভূতি। কবিতাটির নামকরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট স্পর্শ থেকে সরে যাওয়ার পরের প্রসঙ্গই এই কাব্যের মূল সুর। কিন্তু সেই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে যদি স্মৃতি-সুধা রাখা না হয় তাহলে contrast তৈরি হত না। আর এই বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলতে না পারলে বিরহের সুরও এত তীব্রতার সঙ্গে পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হত না। তাই প্রথম চরণেই কবি 'লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা' আর দ্বিতীয় চরণে 'আর আমাদের কথা' এই দুটি চিত্রকল্পকে আমাদের সামনে রাখলেন। আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল লক্ষ লক্ষ ফুলের নিঃশব্দে বিকশিত হওয়ার পবিত্র স্বর্গীয় দৃশ্যের মতোই কবিতার কথক এবং তাঁর সঙ্গীর নির্বাক কথোপকথন। বস্তুত কথা দিয়ে কি আমরা সম্যকভাবে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি? সেক্ষেত্রে হৃদয়ের উপলব্ধি বুঝতে আরেকটা হৃদয়-ই লাগে। কথা সেখানে গৌণ। তাই ফুলের ফুটে ওঠার মতোন কথা বলতে না পারলে সেই স্বর্গীয় অনুভূতির আদান-প্রদান সম্ভব নয়। ঠিক এর পরের দুটি চরণে কবি বললেন 'জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তা/আর আমাদের কথা'। এখানেও সেই 'আমাদের কথা'-কে সম্যকভাবে বোঝানোর চেষ্টাতে কথার বদলে কবি আশ্রয় নিলেন নৈঃস্বর্গিক চিত্রের। এখানে লক্ষণীয় 'আর' শব্দের ব্যবহার। 'আমাদের কথা'-র আগে দুবারই 'আর' বসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখছি 'আমাদের কথা'র আগে 'আর' বসেনি। কেনই বা এখানে 'আর' শব্দের ব্যবহার হল আর পরবর্তীতে কেনই বা হল না সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। তবে তার আগে কবিতাটির পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণের আলোচনায় আসব—

"দোয়েল শ্যামার আনাগোনার সঙ্গে
আমাদের কথা
বৃষ্টির মেঘ গলে পড়ার সঙ্গে
আমাদের কথা।"[৫]

(স্পর্শ থেকে সরে গেলে)

এখানে লক্ষণীয় দোয়েল বা শ্যামার (পাখি) শিষের সঙ্গে কবি 'আমাদের কথা'র তুলনা করেননি। বস্তুত কবি এখানে 'আমাদের কথা'-র সঙ্গে কিছুর-ই তুলনা করেননি। শুধু কিছু নৈঃস্বর্গিক চিত্রের কোলে 'আমাদের কথা'কে স্থাপন করেছেন। আর এই চিত্রগুলিই তাঁর অভিপ্রায়ের প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। দোয়েল, শ্যামার আনাগোনা কিংবা মেঘ গলে বৃষ্টির পড়ার সঙ্গে যে ধ্বনির নিক্কণ বাজে তার সঙ্গে তো হৃদয় স্পন্দনের সরাসরি যোগসূত্র তৈরি হয়। তাই এখানে 'আর' এর ব্যবধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে 'লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা' কিংবা 'জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তা'র সঙ্গে 'আমাদের কথা'-র সরাসরি যেগসূত্র তৈরি হতে পারে না। আর তা পারে না বলেই মাঝখানে 'আর' এর ব্যবধান তৈরি করে পাঠককে ইশারা দিয়ে যান তিনি; কী প্রকাশ করতে চান সেই প্রসঙ্গে।

নবম চরণে এসে কবি যখন বললেন 'আমাদের সেইসব কথা' তখনই এতক্ষণের পবিত্র নিঃস্তব্ধতা ভেঙে গেল। কানে খটকা লাগল। 'আমাদের' আর 'কথা'-র মধ্যে 'কথা'-র নির্দেশক 'সেইসব' শব্দটি বসে একটা অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব তৈরি করেছিল, আর ঠিক এর পরের চরণেই কবি যখন বললেন— 'সরে গিয়ে ক্রমে সরে গিয়ে'— তখন বুঝলাম এই দূরত্ব আলোকবর্ষের চেয়েও বেশি। এই দূরত্বকে সম্যকভাবে প্রকাশ করতে গিয়েই 'সরে গিয়ে' শব্দগুচ্ছটি পর পর দুবার ব্যবহৃত হল। শুধু 'সরে গিয়ে' বললে এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান বোঝানো সম্ভব হত না। যদিও আভিধানিক অর্থে দুবার ব্যবহৃত 'সরে গিয়ে' শব্দের একই অর্থ প্রকাশিত। কিন্তু প্রথমবার ব্যবহৃত 'সরে গিয়ে' শব্দটি যে দূরত্ব প্রকাশ করল, পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সেই একই শব্দ আলোকবর্ষের চেয়েও যেন বেশি দূরত্ব তৈরি করল। সুতরাং বলাই যায় পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সমস্ত শব্দই এমনকি একই আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত একই শব্দ আলাদা আলাদা মনোভাবের প্রকাশে প্রয়াসী হয়। অনিবার্যভাবে যে 'আমাদের কথা' একসময় লক্ষ ফুলের সাথে ফুটে উঠত, জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তার ভাষা পেত, দোয়েল শ্যামার আনাগোনার সঙ্গে কিংবা বৃষ্টির ধ্বনিতে প্রাণ পেত আজ সেই আমাদের এবং কথার—

"মাঝখানে মরা জমি ছাই

হাওয়ার ধুধু ফাঁকা পথ।"[৬]

(স্পর্শ থেকে সরে গেলে)

আমরা এখানে সূত্রাকারে দেখতে পারি একই আভিধানিক অর্থে প্রযুক্ত একই শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ কীভাবে আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশ করছে—

লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা
আর আমাদের কথা — পবিত্র নিঃস্তব্ধতায় হৃদয়ে হৃদয়ে কথা।
জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তা
আর আমাদের কথা — নৈঃস্বর্গিক সৌন্দর্যে উদ্বেলিত দুটি মনের
নীরব মূর্খ উচ্ছ্বাস।
দোয়েল শ্যামার আনাগোনার সঙ্গে
আমাদের কথা। — পৃথিবীর মনুষ্যতর প্রাণের সাথে একাত্মতা।
বৃষ্টির মেঘ গলে পড়ার সঙ্গে
আমাদের কথা — জড়ের মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ খুঁজে
নিয়ে একাত্ম অনুভব করা।
আমাদের সেই সব কথা — পূর্বে যতধরণের অনুভব আমরা প্রকাশ
করার প্রয়াস পেলাম, আজ তা অতীত।

এই রকম বাক্যগত পুনরাবৃত্তি অরুণ মিত্রের একাধিক কবিতায় ঘটেছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' শীর্ষক কবিতায় 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' চরণটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়ে এটি কবিতাটির Key sentence হয়ে উঠেছে। আমরা দেখি কবিতাটির প্রথম স্তবক একটি মাত্র চরণে গঠিত— 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে'? যার মধ্য দিয়ে নিছক বিবৃতি ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায়নি। পরবর্তী চারটি স্তবকের মধ্যে তিনটি স্তবক শুরু হচ্ছে এই key sentence দিয়েই। আর চারটি স্তবকে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে চারটি ভিন্ন অনুষঙ্গ রচিত হচ্ছে। নীচে কবিতাটির নির্বাচিত অংশগুলিকে উদ্ধৃত করে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে—

"আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক
মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর
মতো পালায় অনেক দিনের আশা, ...
এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের
প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ।

. . .

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি
হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে।

. . .

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস! এর তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলি
নদী সাপের মত মোচড়ায়। ...
আরও বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল,
অনেক প্রিয়জনের পাঁজরে গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত! কবে আমার
এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?"[৭]

(এ জ্বালা কখন জুড়োবে)

'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটির প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে মনে হয় পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রণা তথা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মরুভূমি হয়ে যাওয়া জীবনের আর্তনাদ। তাই তো 'কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে', তাইতো 'খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে', আর সেই কারণেই হয়তো; — 'আরও বলি চাই'। কবিতাটির শেষ স্তবক যে দুটি চরণে গঠিত হচ্ছে, এবার নীচে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
কখন?"[৮]

(এ জ্বালা কখন জুড়োবে)

অর্থাৎ প্রথমে যা ছিল নিছক বিবৃতি, পরবর্তীতে এই জিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করেই কবিতার তিনটি স্তবক রচিত হয়েছে। আর শেষে এই জিজ্ঞাসার উচ্চারণেই তা রূপান্তরিত হল অনুভবে। আর শেষ চরণের 'কখন' শব্দটি আবৃত্তির উচ্চারণে যেমন কণ্ঠ থেকে নেমে হৃদয় থেকে উচ্চারিত হবে তেমনি অনুভবের তীব্রতায় তা স্বগতোক্তি হয়ে ওঠে।

এইরকম বাক্যগত পুনরুক্তি অরুণ মিত্রের একাধিক কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ক. "আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।
আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।
আমি অরণ্যের কাছে গিয়ে ঘাসের ফুলের ওপর নত হয়েছি
অবাক হয়ে পুবের দিকে তাকিয়েছি
. . .
আমার আশ্চর্য হওয়ার উপহার তুলে ধরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।
আমি সূর্যের নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি
. . .
আর চৈত্র থেকে আষাঢ়ে আমাকে এগিয়ে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও
. . .
আমের বোলের বাতাস
মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়
তুমি প্রসন্ন হও।
আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি
. . .
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।"[৯]

(আর এক আরম্ভের জন্যে)

'আর এক আরম্ভের জন্যে' শীর্ষক কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয়টি স্তবকেরই শেষ চরণটি হচ্ছে 'তুমি প্রসন্ন হও' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত স্তবকগুলি শেষে এসে মিলছে 'তুমি প্রসন্ন হও' তে। সমস্ত নদীরই শেষ গন্তব্য যেমন সাগরে মিলিয়ে যাওয়া এখানেও যেন তাই। আর তাই অনিবার্যভাবে 'তুমি প্রসন্ন হও' পুনরুক্তির সূত্রে হয়ে উঠেছে কবিতাটির key sentence।

খ. "উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা
. . .

দিনের জোয়ারে তলিয়ে যাবার আগে
নির্জন প্রতিশ্রুতিগুলি শেষবারের মতো ভেসে ওঠে।
. . .
এখন রোদ্দুরের ভূমিকা।
একজন বলে : এই তো ফসল পাকবার রোদ্দুর।
এই কথাটুকু আমরা মনে মনে আঁকড়ে ধরি
যেন আমাদের সমস্ত সান্ত্বনা তাতে রয়েছে।
উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা,
আমাদের প্রতিবিম্ব অগ্নিকোণে।"[১০]

(যাত্রার বেলা)

আমরা এখানে দেখছি কবিতাটি শুরু হচ্ছে যে বাক্য দিয়ে কবিতাটি শেষ হচ্ছে সেই একই বাক্যকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রথমে বাক্যটি ছিল নিতান্তই বিবৃতি। আর শেষে সেই বাক্যটি-ই অগ্নিকোণের অনুষঙ্গে আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ ইশারা দিয়ে যাচ্ছে।

গ. "কোনো বিদায়-সম্ভাষণ নেই
তবু সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যায়,
সঞ্চিত জলে দিনের স্তবক লুটিয়ে পড়েছে
মাটির গহ্বরে তা ছড়াতে হবে
একটি রক্তপদ্ম আছে
দাবদাহের,
. . .
কোনো বিদায়-সম্ভাষণ নেই
তবু সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যায়।
তোমরা যারা এসেছ
গাও তোমরা গান গাও
পরিশুদ্ধ আবেগে কণ্ঠ খোলো,
তোমাদের স্বর আমাকে বিসর্জন দিক
আকাশ-পরিধির সীমায়
অপেক্ষার সময়ের অন্য পারে।"[১১]

(তোমরা গান গাও)

অরুণ মিত্রের এই কবিতাটির প্রথম দুটি চরণ 'কোনো বিদায়-সম্ভাষণ নেই/তবু সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যায়', হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছে ষোলো এবং সতেরো সংখ্যক চরণে এসে। তবে এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। প্রথমে যা কমা দিয়ে শেষ হয়েছে পরবর্তীতে তা পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে শেষ হয়েছে। এই যতি চিহ্নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারে উচ্চারণ তথা মনোভঙ্গির প্রকাশ পালটেছে। প্রথম দুটি চরণের শেষে কমা চিহ্নের ব্যবহার নির্দেশ করে এখানেই শেষ নয় পরে আরও কিছু আছে। বাস্তবিক-ই, আমরা যখন পরের চরণগুলি পড়ি তখন বুঝতে পারি সমস্ত ধ্বনি কোথায় নিরুদ্দেশে যায়। আর দ্বিতীয়বার যখন এই চরণ দুটির পুনরাবৃত্তির শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয় তখন বুঝতে পারি এই দুটি চরণ আসলে উপলব্ধির। স্বগতোক্তির ঢঙে যা উচ্চারিত হয়। আর এইখানেই কবিতার একটি আবর্ত পূর্ণতা পায়। আর এর পরের চরণগুলি নির্দেশ করে ধ্বনি নিরুদ্দেশে যাওয়ার পর কবির আকাঙ্ক্ষাকে। তাই সূত্রাকারে আমরা বলতে পারি উপরিউক্ত দুটি চরণ কবিতার শুরুতে বিবৃতিমূলক, আর পরবর্তীতে পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে চরণদুটি উপলব্ধি নিষ্ণাত হয়ে প্রকাশিত। বস্তুত কোনো বিদায়সম্ভাষণ ছাড়া সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যাওয়ার পর কবির আকাঙ্ক্ষা —

'তোমাদের স্বর আমাকে বিসর্জন দিক/আকাশ-পরিধির সীমায়/অপেক্ষার সময়ের অন্য পারে' — এই দুটি চরণকে আলম্বন করে প্রকাশিত।

ঘ. ''আসবাবপত্তরই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না,
মুখে আমি যত হাসি এঁকেছিলাম বৃথা গেল
যত শোভনতা,
আমি একবার এ-ঘরে একবার ও-ঘরে
তারপর বাইরে।

. . .

আসবাবপত্তরই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না,
ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে
ওরা সবুজ গন্ধ বলে
ওরা বিদ্যুৎঝলক বলে
ওরা আমার রক্তমাংসের অন্ধকার
আচমকা তোলপাড় করে।'[১২]

(স্থিতিহীন)

'স্থিতিহীন' নামক এই কবিতাটিতেও আমরা দেখছি 'আসবাবপত্তরই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না', এই চরণটি দিয়েই কবিতাটি শুরু হচ্ছে, আবার এই বাক্যটিই হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছে দশ সংখ্যক চরণে এসে। কবিতাটি পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি প্রথম চরণটি কেন্দ্র করে প্রথম স্তবকে, আসবাবপত্তর কবিকে তিষ্ঠোতে না দেওয়ার ফলাফল বিবৃত হয়েছে। আর শেষ স্তবকে দশ সংখ্যক চরণে ওই একই বাক্যকে আলম্বন করে কবি হৃদয় খুঁড়ে বার করেছেন আসবাবপত্তর কেন তিষ্ঠোতে দেয় না তার কারণ। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে মনে পড়ে যায় অমরতার কথার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি —

''কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলমিল মুড়ে
ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি।

. . .

...আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভরে অরণ্য
জাগবে।''... [১৩]

(অমরতার কথা)

এবার আমরা অরুণ মিত্রের কবিতা থেকে একটি বাক্যাংশগত পুনরুক্তির উদাহরণ নিতে পারি এবং কেনই বা এই বাক্যাংশগত পুনরুক্তি ঘটল সেবিষয়ে আলোচনা করতে পারি। এখানে আমরা, অরুণ মিত্রের 'একি কোনো নির্জনতা' কবিতার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করতে চাই—

''নির্জনতা আমার জানা
সেই যখন দুপুরে দূরে ঘুঘু ডাকত
বাঁশবনের পথে শাড়ি চুঁইয়ে ভিজে পায়ের ছাপ পড়ত
অথবা সারা খেতটা বুকে আঁকড়ে একটা মানুষ,
ধনুকের মতো টানাটান বেঁকে থাকত

. . .

নির্জনতা আমার জানা।
সেই যখন ফুটপাথের কৃষ্ণচূড়া রোদে টসটস করত
কাঁসরের বাজনা পাষাণে পাষাণে চারিয়ে যেত
অথবা ময়দানের আকাশে সেই তারা খসার ঝোঁক

. . .

নির্জনতা আমি জেনেছি।
নিজেকে বিলোবার নিজেকে সমৃদ্ধ করবার ঘনিষ্ঠ মাটিতে।
আমি এই যেখানে এসেছি
একি কোনো নির্জনতা,
. . .
এত ঝলক তবু সামনে পেছনে দেখি আলোর পাঁচিল
. . .
নিতম্ব জঙ্ঘার ফুর্তি ফুটিয়ে তুলে অভিযাত্রী অভিযাত্রিণীরা,
যেন পায়ের তলার পৃথিবীকে তারা শূন্যের কাছে সঁপে দেবে।"[১৪]

(এ কি কোনো নির্জনতা)

এখানে আমরা দেখছি উদ্ধৃত তিনটি স্তবকের প্রথম স্তবকের প্রথম চরণ আর দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণটি হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শুধু একটাই পার্থক্য থেকে গেছে;— আর তা হল যতিচিহ্নের ব্যবহারে। প্রথম স্তবকের প্রথম চরণ — 'নির্জনতা আমার জানা'-র পরে কোনো বিরাম চিহ্ন নেই। কারণ কবি এখানে আকস্মিকভাবে তাঁর এক সাধারণ অভ্যাসের কথা, সাধারণ বর্তমানকালে লেখেন। তাই, কোন্ নির্জনতার কথা এখানে তিনি বলতে চান পরবর্তী চরণগুলিতে তা-ই প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠিক পরের স্তবকে দেখি 'নির্জনতা আমার জানা'-র পরে পূর্ণচ্ছেদ আছে। অর্থাৎ এখানে 'নির্জনতা আমার জানা' আর নিছক বিবৃতি হয়ে থাকেনি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মোপলব্ধি। তারপরেই আবার তিনি ফিরে যান স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে অতীতে। আর তৃতীয় স্তবকে এসে 'নির্জনতা আমার জানা'কে সামান্য পালটে যখন লেখেন— 'নির্জনতা আমি জেনেছি' তখন ক্রিয়ার কালগত পার্থক্য ঘটে যায় পূর্বের বাক্যটির সঙ্গে। পুরাঘটিত বর্তমানে লেখা এবাক্যে কবির অনুভবের সঙ্গে যেন আলাদা করে যোগ হয়েছে প্রত্যয়ের। এবার আমরা 'নির্জনতা আমার জানা' এবং 'নির্জনতা আমি জেনেছি' এই দুটি বাক্যকে কবিতার আলম্বন হিসেবে ধরে ক্রিয়ার কালগত দিক থেকে আলোচনা করে দেখব। আমরা আগেই বলেছি 'নির্জনতা আমার জানা' বাক্যটি সাধারণ বর্তমানে লেখা এবং এই বাক্যটি পর পর দুই স্তবকের শুরুতে বসেছে। আর এই বাক্যটিকে আশ্রয় করেই দুটি স্তবক বিকশিত হয়েছে। এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করে দুটি স্তবকের সমস্ত পঙ্‌ক্তি ঘটমান অতীতে রচিত। তাই বলাই যায় প্রথম দুটি স্তবক সাধারণ বর্তমানে রচিত কবিতাটির Key sentence কে কেন্দ্র করে ঘটমান অতীতের দিকে নিরন্তর যাত্রা করেছে। যার ফলে স্মৃতিচারণের সুরে অতীত-বর্তমানের মেলবন্ধনে, বিবৃতি থেকে আত্মোপলব্ধিতে উত্তরণ ঘটেছে।

তৃতীয় স্তবকের শুরুতে কবি যখন উচ্চারণ করেন 'নির্জনতা আমি জেনেছি' তখন-ই বাক্যাংশগত পুনরাবৃত্তিতে ক্রিয়ার কালের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের সুর পালটে যায়। আর এই পঙ্‌ক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তৃতীয় স্তবকের সমস্ত পঙ্‌ক্তিও হয় সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, নয় ঘটমান বর্তমান, নাহলে সাধারণ ভবিষ্যৎকালে লেখা। এখানে আর অতীতের স্মৃতিচারণা নেই। পুরাঘটিত বর্তমানকে কেন্দ্র করে এখানে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর এখানেই বাক্যাংশগত পুনরাবৃত্তিটি আর নিছক পুনরাবৃত্তি না থেকে স্বতন্ত্র তাৎপর্য লাভ করে। বস্তুত, বিবৃতি উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রত্যয়ী হয়ে উঠে আগামীর দিকে যাত্রা করার সংকল্প নেয়।

অরুণ মিত্রের একাধিক কবিতার এইরকম বাক্যাংশগত পুনরুক্তি স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নীচে আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—

"আমি তোমাদের ডাকছি
. . .
আমার সামনে প্রখর বসন্ত
বসন্তের রং ফুল লতাপাতার শিখা
আমার আশার অন্ত নেই
আমি জ্বলব পৃথিবীর রঙে
আমি জ্বলব সকলের চোখে।"[১৫]

(কয়েকটি কথা)

'কয়েকটি কথা' নামক এই কবিতায় কবি বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের যে স্বপ্নের দিন গুনছেন তারই প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাই তিনি বসন্তের বাহারি রঙে নিজের মনকে রাঙিয়ে নিজের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—

"আমি জ্বলব পৃথিবীর রঙে।"[১৬]

(কয়েকটি কথা)

আর তিনি যখন প্রকৃতির রঙের আগুনে আর মনের পুলকে জ্বলে উঠবেন সেই দৃশ্য তো সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে তাঁদের হৃদয়েও সঞ্চারিত হবে। তখন যেন তাঁরাও বলে উঠবেন 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম, চোখের বাহিরে'। আর এখানেই 'আমি জ্বলব' দুটি পৃথক চরণে আলাদা আলাদা তাৎপর্যে ব্যবহৃত।

অরুণ মিত্রের কবিতা থেকে বাক্যাংশগত পুনরুক্তির আরও কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে—

". . . সে আবর্তে দাঁড়িয়ে বুক চেপে
"এত আলো সয় না সয় না" বলে,
তারপর মরে যায়,
রোজ দেখি মরে যায়।"[১৭]

(কয়েকটি কথা)

কিংবা

"শুকিয়ে যাওয়ার বড়ো ভয় রয়েছে। কোথায় কোন্ ফাটল দিয়ে নেমে কোথায় পৌঁছোনো, সে এক আঢুল রাত্তির বিছিয়ে যাওয়া আর রস টানা, ...যেখানে আকাঁড়া চাঙ গলে ফল গজাবার পাকবার টগবগানি। তবেই তোমার কথা টইটুম্বুর। নইলে ওই তো শব্দগুলো মরাকাঠ। তোমার আঙুল শুকনো গুঁড়োর মধ্যে খেলে আর ঝুরঝুর করে উড়ে যায় অক্ষর, বুকের আওয়াজ, ভালোবাসার মানুষ। শুকিয়ে যাওয়ার এই ভয়।"[১৮]

(তবেই তোমার কথা টইটুম্বুর)

আমরা পুনরুক্তির আলোচনা শেষ করব শব্দগত পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে। অরুণ মিত্রের অজস্র কবিতায় এই শব্দগত পুনরুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে কোন তাৎপর্যে শৈলীর এই বিশেষ রীতির প্রয়োগ ঘটেছে তা আমরা আলোচনা করব। অরুণ মিত্র 'কলকাতা' কবিতায় লিখছেন —

"কলকাতা আমাকে ডেকে নেয়
বহুকালের ডাকে
বেনামি ভিড় থেকে টেনে নেয়
তীব্র চেনা বাঁকে,
. . .
আমার গাঁয়ের বাংলা ফিরে ফিরে আসে
কলকাতায়।

কুঁড়ে ঘরে কোন্ কান্না শুনেছিলাম
সন্ধ্যায় বা শেষরাতে
মজা গাঙের ধারে সর্‌সর্ হাওয়ায়
তা যেন কলকাতার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপায়,
. . .
শ্মশানের গা-ছমছম রাস্তা যেন চলে আসে
কত ক্রোশ পার হয়ে
কলকাতায়।
আমি পাকা ধানের হাসি দেখেছিলাম

বুড়োবুড়ির ঠোঁটে,
ছেলেমেয়ের মেলায় রেখেছিলাম
আলো,
তা জ্বলজ্বল করে
হঠাৎ কলকাতায়।
. . .
যে-আবেগের ঢেউ আলের সীমানা ছাড়াত
উঠোন নারকেলতলা মুহুর্মুহু টলাত
বাধা পেয়ে ব্যর্থতায় আরেক সংকল্পে
তার কল্লোল ভেঙে পড়ে
পাষাণের কলকাতায়।

কলকাতায় আমার বন্ধুরা
আমাকে অভিভূত করে,
. . .
কলকাতা আমার খুব কাছে আসে
আমি তাকে ধমনিতে পাই,"[১৯]

(কলকাতায়)

এই কবিতাটিতে আমরা দেখছি কলকাতা এই স্থানবাচক বিশেষ্যপদটি আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কলকাতা বিভিন্ন অনুষঙ্গে এসেছে। বেনামি ভিড়ের মাঝে একা দাঁড়িয়ে থাকা কবিকে যেমন কলকাতা 'তীব্র চেনা বাঁকে' ডেকে নিয়েছে, তেমনি গাঁয়ের বাংলাকেও কবি কলকাতার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তাই অনিবার্যভাবেই কলকাতা হয়ে উঠেছে আশ্রয়দাত্রী জননী। সংগত কারণেই কবি কান্নার আওয়াজ শুনে কলকাতার বুককে কল্পনা করেন। এখানে 'যেন'র প্রয়োগ লক্ষণীয়। আদতে এই কান্না হয়তো কবি কলকাতার বাইরে কোথাও শুনেছেন। আর শুনেই তাকে ঠাঁই দিতে চেয়েছেন তাঁর ধাত্রীভূমি কলকাতার বুকে। এই ধাত্রীভূমিই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে শ্মশানের 'গা-ছমছম' রাস্তার শেষে জীবনের আঁতুড়ঘর। কখনও বা প্রেমের উন্মাদনার কিংবা 'বুড়োবুড়ির ঠোঁটে' লেগে থাকা 'পাকা ধানের হাসি'র মতো অনাবিল প্রেমের জ্বলজ্বলে আলো কবি কলকাতায় অনুভব করেন। এরই পাশাপাশি 'পাষাণের কলকাতা'কেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বাল্য-কৈশোর আর যৌবনের কলকাতা, পড়াশোনার কলকাতা, প্রথম কর্মক্ষেত্রের কলকাতা তাঁকে বন্ধুত্ব দিয়েছে। সেই অমলিন বন্ধুতার কথা লিখতে গিয়ে কবি বলেন —

"তারা আমাকে বাঁচবার কথা বলে,
ঘৃণাকে প্রবল করে,
ক্রোধকে প্রবল করে
প্রেমকে প্রবল করে
এক শুদ্ধ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বলে,
তারা বলে ঈর্ষাকে সে-আগুনে পুড়িয়ে দিতে
ছোটো ছোটো মনগুলো জঞ্জালের মতো সে-আগুনে ফেলে দিতে।"[২০]

(কলকাতায়)

বস্তুত যে শহর জানে তাঁর প্রথম সবকিছু, তার স্পন্দন তো স্বাভাবিকভাবেই কবির ধমনীতে বাজবে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে আমরা নাগরিক কবিয়ালের একটি গানের দুটি লাইনকে একটু পালটে উদ্ধৃত করতে চাই—

"প্রথম যৌবনের শেষে মাঝবয়সে আসা
কলকাতা নিয়ে গান বেঁধেছে কবির ভালোবাসা।"

বস্তুত আমরা আগেই বলেছি 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি —

১. ফ্রান্সে যাওয়ার আগে রচিত কবিতা।

২. ফ্রান্সে থাকাকালীন এবং তার পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতা।

এই কবিতাটি 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতা। তাই আন্দাজ করা যায় কবিতাটি ফ্রান্সে থাকাকালীন বা তার পরবর্তীসময়ের কবিতা। বস্তুত এই কাব্যগ্রন্থে মোট ৪৯টি কবিতা আছে। 'কলকাতায়' কবিতাটি ৪২ সংখ্যক কবিতা। তাই খুব সম্ভবত এই কবিতাটি এলাহাবাদে থাকাকালীন-ই লেখা। ১৯৫১-তে ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরে ১৯৫২-তে অরুণ মিত্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। কবিতাটির প্রসঙ্গ এবং আঙ্গিক ও আমাদের অনুমানকেই সমর্থন করে। তাই বলাই যায়— কলকাতার প্রতি যে তীব্র টান অনুভব করেন সেই কলকাতার স্মৃতি-ই তাঁকে দিয়ে এই কবিতাটি লিখিয়ে নেয়। তাই তীব্র মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকেই 'কলকাতা' শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হয় কবিতায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে অরুণ মিত্রের একটি প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করতে পারি—

> "ছিলাম বটে এলাহাবাদে। কিন্তু সত্যিকার বাসিন্দা ছিলাম কলকাতার, ঠিক যেমন ছোটোবেলায় থাকতাম কলকাতায় কিন্তু বাস করতাম যশোরে। প্রত্যেক ছুটিতে আমি এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছি এবং এলাহাবাদে ফেরার সময় মনে করেছি ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি। বরাবর অনুভব করেছি আমার সমস্ত শিকড় এই কলকাতায়, এই বাংলাদেশের মাটিতে গাড়া রয়েছে। এই অনুভূতির কথা আমার একাধিক কবিতায় প্রকাশও করেছি।'[২১]

এইরকম শব্দগত পুনরুক্তি অরুণ মিত্রের অসংখ্য কবিতাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। নীচে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

> "মিথ্যা নয় অভিশাপ লেগেছে তোমার,
> যুক্তিহীন অসংগত অন্ধ অভিশাপ।"[২২]
>
> (আচ্ছন্ন)

প্রথম চরণে যে 'অভিশাপ' শব্দটি ছিল শুধুই বিবৃতিমূলক, দ্বিতীয় চরণে যখন অভিশাপের বিশেষণ হিসেবে 'যুক্তিহীন অসংগত অন্ধ' শব্দগুলি যতিচিহ্নের ব্যবহার ছাড়া পর পর অবস্থান করে সেই অভিশাপকে সম্যকভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করল তখনই আমরা বিবৃতি থেকে বোধের কাছে পৌঁছালাম।

নীচে অরুণ মিত্রের কবিতা থেকে আরও কয়েকটি শব্দগত পুনরুক্তির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে—

> "এই প্রান্তে উচ্ছন্ন ঘর। আমাদের আওয়াজ ঝাউয়ের হাওয়ার সঙ্গে ফেরে আর
> নদীর ধসে নামে। ...
> আশা আর অনুশোচনার অসহ্য ভার আমরা ধু ধু মাঠের ওপর ছুঁড়ে দিই।
> আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথরমাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাও,
> যেখানে চিরকালের মতো আমি তোমায় ঢেকে থাকব।
> সব ভান আমরা খসিয়ে ফেলি।
> এই প্রান্তে আমরা উজাড় হয়ে যাই। এই প্রান্তে।"[২৩]
>
> (এই প্রান্তে)

একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি যে প্রতিটি চরণের অনুষঙ্গে আলাদা আলাদা অর্থ তৈরি করতে পারে তার অনবদ্য উদাহরণ 'পুতুলনাচ' কবিতায় আমরা দেখি —

> "চোখ-রাঙানো পুতুল
> দে-দোল-দোল পুতুল
> কলম-নাচানো পুতুল
> আপ্‌নি-মোড়ল পুতুল
> বোম্বাই গানের পুতুল
> পার্টিতে যাবার পুতুল

তোতা-বুলির পুতুল
হৃদয়দানের পুতুল
তালি বাজাবার পুতুল
কানা গলির পুতুল।"[২৪]

(পুতুল নাচ)

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটি শব্দের এক বা একাধিক চরণে পুনরাবৃত্তির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। এবার আমরা, সমজাতীয় শব্দের ব্যবহারে কীভাবে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবং আপাত বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি বিনিসুতোয় মালায় গ্রথিত হচ্ছে তা দেখে নিতে পারি —

"দুব্বার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা
এইসব নিশান ধরেই
এখানে ফিরেছি আমি।"[২৫]

(জনমদুখিনির ঘর)

এখানে 'দুব্বার ছোপ', 'ধানের গুচ্ছের ছটা' দোয়েল, ফিঙে টুনটুনির 'নরম হাসির আভা' মিলে নিশান তৈরি করেছে। অর্থাৎ ছোপ, ছটা এবং আভা শব্দের ব্যবহারে আমরা বুঝতে পারি এখানে নিশানের স্পষ্ট কোনো চিহ্ন নেই, আছে শুধু কিছু ইশারা। তাই এখানে ইশারাময় চিহ্নের কথা বলতে গিয়ে ছোপ, ছটা এবং আভা-র ব্যবহার করা হয়েছে। আরও একটি উদাহরণ এখানে আমরা নিতে পারি—

"আসবাবপত্তরই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না,
মুখে আমি যত হাসি এঁকেছিলাম বৃথা গেল
যত শোভনতা,
আমি একবার এ-ঘরে একবার ও-ঘরে
তারপর বাইরে।
. . .
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ধাক্কায় আমি ভিটেছাড়া
আমি খোলা রাস্তায়।
. . .
ওরা আমার রক্তমাংসের অন্ধকার
আচমকা তোলপাড় করে।"[২৬]

(স্থিতিহীন)

এখানেও আমরা দেখছি কয়েকটি শব্দ মিলে একটি ভাবকে সংবদ্ধ করে তুলছে। যেমন— তিষ্ঠোতে দেয় না → বৃথা গেল যত শোভনতা → তারপর বাইরে → খোলা রাস্তায় → তোলপাড় করে।

বস্তুত তিষ্ঠোতে না দেওয়ার মধ্যে যে অস্থিরতা আছে, সেই অস্থিরতার ফলাফল হিসেবেই ব্যর্থতার অনুভূতি (বৃথা গেল যত শোভনতা) এসেছে। পরবর্তীতে দেখি সেই অস্থিরতার অনিবার্য পরিণতিতেই ক্রমানুযায়ী এসেছে 'তারপর বাইরে', 'খোলা রাস্তায়'। এখানে 'বাইরে' বলতে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন খোলা রাস্তায়। আর শেষ দুটি চরণ আসলে প্রথম চরণটিরই সম্প্রসারণ —

"ওরা আমার রক্তমাংসের অন্ধকার
আচমকা তোলপাড় করে।"

এখানে ওরা বলতে আসবাবপত্তরের কথাই বলা হয়েছে। প্রথম চরণে যে আসবাবপত্তর তাঁকে তিষ্ঠোতে দেয় না বলেছেন, এখানে সেই 'তিষ্ঠোতে দেয় না' ক্রিয়াগুচ্ছকে সম্যকভাবে justify করছে 'তোলপাড় করে'।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বলতেই হবে, সংসক্তির উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম পুনরুক্তি। সংসক্তি নিয়ে কোনো প্রবন্ধ লিখলে এ নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধুমাত্র এইটুকু উল্লেখ করতে চাইব Jeffries এবং McIntyre তাঁদের পর্যবেক্ষণে সংসক্তি সংঘটনের পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই পুনরুক্তিকে স্থান দিয়েছেন —

> "The main mechanism of cohesion are : Repetition—of similar or identical words, phrases or clauses."[২৭]

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, অরুণ, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৬৯
২. দাশ, শিশির কুমার, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩০
৩. Croft, Steven, Myers Robert, Exploring Language of Literature, Oxford University Press, London, 2000, P. 57
৪. মিত্র, অরুণ, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৭১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫, ৯৬
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭, ১৪৮
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১, ১৫২
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩, ২৯৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬, ৯৭, ৯৮
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
২১. গুহ, চিন্ময় (সম্পাঃ) প্রবন্ধ সংগ্রহ ২, অরুন মিত্র, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২৯
২২. মিত্র, অরুণ, কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪১
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ.১১৬, ১১৭
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৬
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৩, ১৩৪
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩, ২৯৪
২৭. Jeffries, Lesley, McIntyre Dan, Stylistics, Cambridge University Press, New York, 2010, P. 85